পাহাড়ী কৃষি

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত বিস্তীর্ণ এলাকাকে পার্বত্য অঞ্চল বলা হয়। খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি এবং বান্দরবান এই ৩টি জেলা নিয়ে পার্বত্য অঞ্চল গঠিত। এ অঞ্চলের মোট আয়তন ১৩১৯১ বর্গ কিলোমিটার যা দেশের মোট মূলভাগের প্রায় এক দশমাংশ। অসমতল বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি ও অন্যান্য কারণে এ অঞ্চল মাঠ ফসল উৎপাদনের জন্য তেমন উপযোগী নয়। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে বিভিন্ন রকম উদ্যান ফসল উৎপাদনের সম্ভবনা এখানে ব্যাপক। বর্তমানে পার্বত্য অঞ্চলে 'জুম' চাষের যে ব্যাপক প্রচলন বিদ্যমান যা ভূমির ক্ষয়, গাছ পালা নিধন সর্বোপরি পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এ ছাড়া এ পদ্ধতিতে কাঙ্ক্ষিত ফলনও পাওয়া সম্ভব নয়। তাই অধিক ফলন ভূমির ক্ষয় রোধ এবং পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য আধুনিক এবং স্থায়ী খামার ব্যবস্থা গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ৩টি গবেষণা উপকেন্দ্রের মাধ্যমে এ অঞ্চলে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গবেষণার মাধ্যমে এ অঞ্চলে চাষাবাদের উপযোগী বিভিন্ন ফসলের উন্নত জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। গবেষণা উপকেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে এসব প্রযুক্তি কৃষক পর্যায় সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

পাহাড়ী কৃষি

ম্যাথ মডেল

'ম্যাথ' হলো পাহাড়ী অঞ্চলের উপযোগী চাষাবাদের একটি মডেল যার পুরো নাম Modern Agricultural Technology in the Hilis (MATH)। এই মডেল অনুসরণ করে ভূমির ক্ষয়রোধ ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে একই জমিতে উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে পাহাড়ী অঞ্চলের কৃষকদের ব্যাপক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব। এছাড়া, এই মডেলের মাধ্যমে 'জুম' চাষকে সরাসরি নিরুৎসাহিত না করে পর্যায়ক্রমে 'জুম' চাষ বিলুপ্ত করা সম্ভব।

'ম্যাথ' বাস্তবায়ন পদ্ধতি

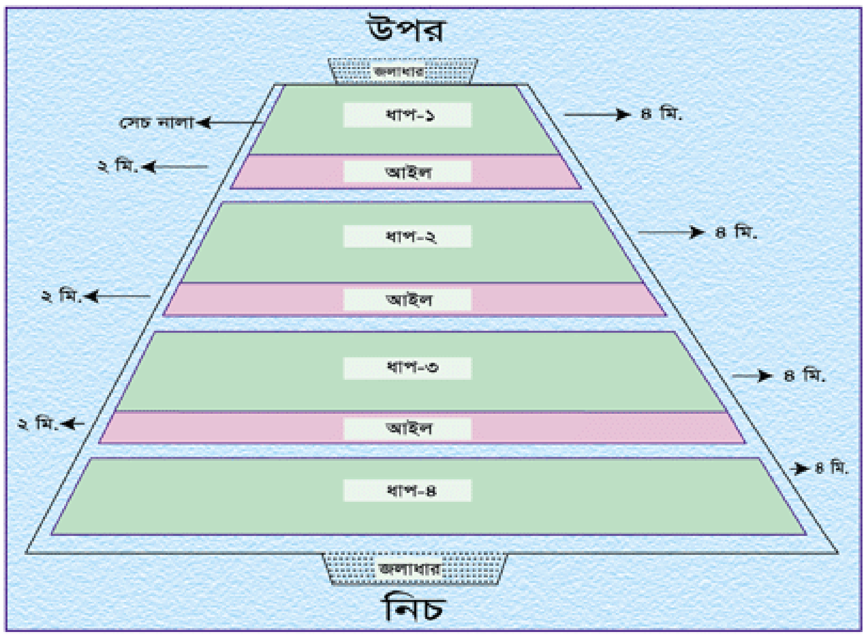

ধাপ-১ : জমি নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'জুমি' ফসলগুলো আবাদের ব্যবস্থা করা।

ধাপ-২ : প্রথম বৃষ্টির পর পরই 'ম্যাথ' মডেলের অনুসরণে দ্রুত বর্ধনশীল ফসল যেমন, পেঁপে, কলা, স্বল্প মেয়াদী পেঁয়ারা, লেবু, দীর্ঘ মেয়াদী কাঁঠাল, লিচু, আম, সফেদা, জাম্বুরা, কমলা, জাম, ইত্যাদি এবং বনজ গাছ 'জুম' ক্ষেতে একই সময়ে রোপণ করা।

ধাপ-৩ : ধান, মারফা, কাউন, ভুট্টা ও তিল সংগ্রহের পর পাহাড়ের ঢালভেদে 'জুম' ক্ষেতের মধ্যে আড়াআড়িভাবে সারিতে (Strip cultivation) আনারস, অড়হর, ইত্যাদি ফসল রোপণ/বপন করা।

ধাপ-৪ : সময়ভেদে 'জুমি' ফসল সংগ্রহের পর মৌসুম ভিত্তিক (কচু, ঢেঁড়স, বরবটি, টমেটো, বেগুন ও মরিচ ইত্যাদি) ফসলের আবাদ করা।

ধাপ-৫ : সবজি চাষের পাশাপাশি জমি পরিষ্কার করে 'আচ্ছাদন ক্রপ' (Cover crop) আবাদ করা।

ধাপ-৬ : 'ম্যাথ'-এর আওতায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য কৃষক সমিতি গঠন করে Central Procurement and Distribution Point (CPDP)-এর মাধ্যমে বাজারজাত করা।

ধাপ-৭ : মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কর্তৃক তিন ভাগে বিভক্ত পাহাড়ের ১ম ও ২য় শ্রেণির পাহাড়ের বেলায় 'ম্যাথ' মডেলটি প্রযোজ্য। অন্যথায়, যেখানে 'জুম' আছে সেখানেই উক্ত মডেল কার্যকর হবে।

পাহাড়ে উন্নত পদ্ধতিতে সবজি চাষ

'ম্যাথ' মডেলের উপকারিতা

- ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
- একই জমিতে বহু ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে পাহাড়ী কৃষকদের স্থায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।
- শস্য পর্যায় (Crop rotation) অবলম্বনের মাধ্যমে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা ও মাটির ক্ষয় রোধ করা।
- স্থায়ীভাবে বনায়ন সৃষ্টির মাধ্যমে প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ করা। Central Procurement and Distribution Point (CPDP)-এর মাধ্যমে উৎপাদতি পণ্যের সমবায় ভিত্তিক বাজারজাতকরণ।
- পর্যায়ক্রমে 'ম্যাথ' মডেলের বাস্তবায়ন হলে পাহাড়ী অঞ্চলে 'জুম' চাষ বিলুপ্ত হবে।
- সর্বোপরি পাহাড়ী এলাকায় ফসলের ফলন বৃদ্ধি পাবে, মাটির ক্ষয়রোধ হবে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হবে ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা পাবে।

বসত বাড়িতে সবজি চাষ 'খাগড়াছড়ি মডেল'

পাহাড়ী এলাকায় বসত বাড়িতে সারা বছরব্যাপী সবজি চাষের জন্য পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি কর্তৃক 'খাগড়াছড়ি সবজি চাষ মডেল' এর উদ্ভাবন করা হয়। এই মডেলে ৩টি বেড পাশাপাশি তৈরি করে সারা বছর সবজি চাষ করা হয়। প্রতি বেডের প্রস্থ ৩ হাত (১.৩ মিটার) এবং দৈর্ঘ্য ১০ হাত (৫ মিটার)। তবে বেডের দৈর্ঘ্য কৃষকের জমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে কম বেশি হতে পারে। দুই বেডের মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে ১ হাত (প্রায় ৫০ সেমি)।

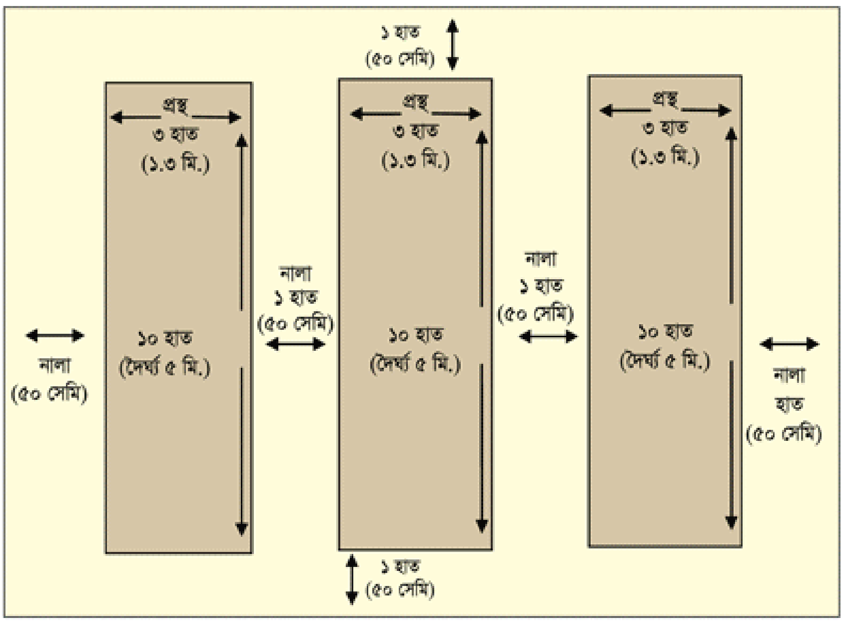

বসত বাড়িতে সবজি চাষ (খাগড়াছড়ি মডেল)

সবজি বিন্যাস: সবজি বাগানের তিন খণ্ড জমিতে বা বেডে যে ৩টি সবজি বিন্যাস অনুসরণ করা হয়, এখানে সেগুলোর একটি তালিকা দেওয়া হলো।

বেড	(অক্টোবর-ফেব্রুয়ারি) রবি	(মার্চ-মে) খরিফ ১	(জুন-সেপ্টেম্বর) খরিফ ২
বেড ১	রাইশাক - লালশাক	লাল শাক	বারি পানি কচু-২
বেড ২	লালশাক - ডাঁটা শাক	কুমড়া শাক	পুঁই শাক
বেড ৩	মুলাশাক-কুমড়া শাক	পুঁই শাক	গিমা কলমী

পাহাড়ী এলাকায় টেকসই কৃষির জন্য বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ প্রযুক্তি

পাহাড়ী এলাকার কৃষকেরা মূলত বৃষ্টিনির্ভর কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এখানে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে ফসল উৎপাদনের এলাকা শতকরা এক ভাগেরও কম। ফলে শুষ্ক মৌসুমে প্রয়োজনীয় পানির সরবরাহ থাকে একেবারে অপ্রতুল। এখানকার বেশিরভাগ পাহাড় ও সমতল ভূমি সেচের পানির অভাবে অনাবাদি পড়ে থাকে। ফলে অত্র অঞ্চলের কৃষকদের বৃষ্টিনির্ভর জুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছে। পাহাড়ী ঝর্ণা, ছড়া, চেঙ্গি, মাইনী, ফেনী নদী এখানকার পানির প্রধান উৎস। গবেষণার এক তথ্যে জানা যায়, গত একদশকে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পাহাড়ী এলাকায় গড়ে ১৫০০০-২০০০ মি.মি. বৃষ্টি কমে গেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সঠিক সময়ে তথা খরায় পাহাড়ী কৃষকের জীবন ও জীবিকা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ

এজন্য এখনই বৃষ্টির পানি সংরক্ষণপূর্বক বিভিন্ন লাগসই, খাপখাওয়ানোর উপায় সমৃদ্ধ প্রযুক্তি উদ্ভাবন প্রয়োজন। উক্ত প্রয়োজনের কথা অনুধাবন করে পাহাড়ী অঞ্চলের জন্য উপযোগী পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি থেকে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে কৃষি, বাসা-বাড়ি এবং নদীর নাব্যতার জন্য প্রয়োজনীয় পানির চাহিদার যোগান হয়।

বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি

১. জলাধারের মাধ্যমে।

২. বাসা-বাড়ির ছাদের উপরের অংশের মাধ্যমে।

পাহাড়ী এলাকার নিম্নাংশে দুই পাহাড়ে বাঁধ দিয়ে ছোট ছোট পানি সংরক্ষণাগার তৈরি করা হয়। পরে ধরে রাখা বৃষ্টির পানি শুষ্ক মৌসুমে পাহাড়ী সমতল ভূমিতে বিনা খরচে কৃষি জমিতে সেচের মাধ্যমে যে কোন ধরনের শস্য, ফল কিংবা অন্যান্য ফসল উৎপাদন করা সম্ভব। এই সংরক্ষিত পানি লো-লিফট সেচ পাম্পের মাধ্যমে পাহাড়ের চূড়ায় উত্তলন করে সেচের মাধ্যমে পাহাড়ের সকল অংশ চাষাবাদের আওতায় আনা যায়। আবার দেখা যায় যে, শুষ্ক মৌসুমে ভূনিম্নস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যায়। ফলে পাম্প দিয়ে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করা সম্ভব হয় না। তাই বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করলে জলাধারের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির অভাব পূরণ হয় এবং পানির স্তর উপরে উঠে আসে। ফলে পাম্পের মাধ্যমে পানি উত্তোলন করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায়।

বসতবাড়িতে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও আয় বৃদ্ধি

গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ হিসেবে 'বারি পেঁয়াজ-৫' জাতটি সারা বছর ব্যাপী বসতবাড়িতে উৎপাদন করা যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, খাগড়াছড়ি জেলায় মাত্র ১১ হাত × ৪.৫ হাত পরিমাণ জমিতে ফেব্রুয়ারি (মাঘ) মাসে চারা রোপণ করে ২১ কেজি এবং সেপ্টেম্বর (ভাদ্র) মাসে চারা রোপণ করে ৩০ কেজি ফলন পাওয়া যায় অর্থাৎ একই জমিতে বৎসরে দুই বার 'বারি পেঁয়াজ-৫' চাষ করে সর্বমোট ৫১ কেজি ফলন পাওয়া যায়। এক হিসেবে দেখা গেছে, ৪-৫ জন লোক বিশিষ্ট একটি পরিবারের মাসে গড়ে ৪ কেজি পেঁয়াজের প্রয়োজন হয়। সে হিসেবে একটি পরিবারের বার্ষিক পেঁয়াজের চাহিদা সর্বমোট ৪৮ কেজি। তাই ১১ হাত × ৪.৫ হাত পরিমাণ জমিতে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদনের এই প্রযুক্তিটির ব্যবহার করে প্রতিটি পাহাড়ী কৃষক পরিবার নিজেদের বার্ষিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি অতিরিক্ত উৎপাদিত পেঁয়াজ বিক্রি করে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুসারে বাংলাদেশ প্রায় ২ কেটি বসতবাড়ি আছে। গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদনের উক্ত প্রযুক্তিটি যদি বাংলাদশের ৫০ লক্ষ বসতবাড়িতেও প্রচলন করা যায় তবে ৫ হাজার হেক্টর জমি পেঁয়াজ চাষের আওতায় আনা সম্ভব হবে এবং এতে ২,৬৬,৫০০ মেট্রিক টন পেঁয়াজ উৎপাদিত হবে। আমাদের দেশে পেঁয়াজের বাৎসরিক ঘাটাতি প্রায় ৫ লক্ষ মেট্রিক টন। যদি পেঁয়াজ বাসতবাড়িতে উৎপাদন করা সম্ভব হয় তবে এই প্রযুক্তিটির মাধ্যমে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ১৫ টাকা হারে বৎসরে দেশের প্রায় ৪০০ কোটি টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব হবে। পরিবারের সারা বছরের চাহিদা মিটানোর পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন, মহিলাদের কর্মসংস্থান ও পরিবারের আয়ও বৃদ্ধি করা সম্ভব।

তলোয়ার শিমের উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি

সুনিষ্কাশিত যে কোন ধরনের মাটি তলোয়ার শিম চাষের জন্য উপযোগী। তবে উর্বর দোআঁশ মাটিতে উৎপাদন ভাল হয়। পার্বত্য অঞ্চলসহ বাংলাদেশের সর্বত্র তলোয়ার শিমের চাষ করা যায়।

বীজের পরিমাণ

হেক্টরপ্রতি ৪০-৫০ কেজি।

বীজ বপন পদ্ধতি

সরাসরি মাদায় বা সারি করে বীজ বপন করা হয়। বর্ষাকালে চাষ হওয়ায় উঁচু বেড়ে মাদা তৈরি করে বীজ বপন করা প্রয়োজন। লতানো জাতের জন্য বর্গাকারে ১০০-২০০ সেমি দূরত্বের মাদায় এবং ঝোপালো জাতের ক্ষেত্রে বেড়ে ১০০-১২০ সেমি সারিতে ৬০-৭৫ সেমি দূরে দূরে মাদায় ১ বা ২টি করে বীজ বুনতে হবে।

তলোয়ার শিম

বপনের সময়

বৈশাখ মাস থেকে আষাঢ় মাস (মধ্য-এপ্রিল থেকে জুলাই)। তবে সারা বছর চাষ করা যায়, কারণ জাতটি দিবস নিরপেক্ষ।

সারের পরিমাণ

তলোয়ার শিমের জন্য হেক্টরপ্রতি নিম্নরূপ সার প্রয়োগ করতে হয়

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	১০০-১৪২০ কেজি
টিএসপি	২০০-২৪০ কেজি
এমপি	১৫০-১৬০ কেজি
পচা গোবর/কম্পোস্ট	১০-১২ টন
চুন (প্রয়োজনবোধে)	২ টন

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে ডিবলিং পদ্ধতিতে সমুদয় গোবর, টিএসপি, অর্ধেক এমপি এবং তিন ভাগের একভাগ ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হয়। বাকি এমপি ও ইউরিয়া রোপণের ৩০ ও ৬০ দিন পরে সমানভাবে উপরি প্রয়োগ করতে হয়। বপনের এক সপ্তাহ আগে ডিবলিং পদ্ধতিতে জমিতে চুন প্রয়োগ করতে হয়।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

ঝোপালো জাত হলে বাঁশের শক্ত কাঠি বা কঞ্চি দ্বারা আর লতানো জাত হলে বড় শাখা বা মাচা দ্বারা সাপোর্ট প্রয়োজন। ভালভাবে পানি নিকাশের জন্য জমিতে নালা থাকা প্রয়োজন। সময়মত আগাছা দমন, মাল্‌চিং, সার প্রয়োগ, সেচ প্রদান ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

ফসল সংগ্রহ

গাছে ফুল ফোঁটার ১৫-২০ দিনের মধ্যে তলোয়ার শিম খাওয়ার উপযোগী হয়। দিবস নিরপেক্ষ জাত (অগ্রবর্তী লাইন SB001) রোপণের ৬০-৭৫ দিনে এবং অন্যান্য জাতের ফসল মধ্য-ভাদ্র থেকে মধ্য-আশ্বিন (সেপ্টেম্বর) মাসে তোলা যায়।

পাহাড়ী অঞ্চলে উন্নত ঝাড়শিমের চাষ

ঝাড়শিম একটি সুস্বাদু পুষ্টিকর সবজি। বারি ঝাড়শিম একটি উচ্চ ফলনশীল জাত। জাতটি ইতোমধ্যে পাহাড়ী এলাকায় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

জমি ও মাটি

পার্বত্য এলাকার উর্বর বেলে দোআঁশ থেকে দোআঁশ মাটিযুক্ত পাহাড়ের ভ্যালী বা উপত্যকা, পাদদেশ ও সামান্য ঢালের জমি ঝাড়শিম চাষের উপযোগী। হালকা ছায়াযুক্ত স্থানেও ঝাড়শিম চাষ করা যায়। ভুট্টার সাথে আন্তঃফসল হিসেবেও পার্বত্য এলাকায় এর ফলন বেশ ভাল হয়। পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন ছড়া বা নালার তীরে ঝাড়শিম চাষ করা সম্ভব।

উন্নত ঝাড়শিমের ফসল

বপন পদ্ধতি

বপনের আগে বীজ ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে নিলে অঙ্কুরোদগম ত্বরান্বিত হয়। জমিতে সরাসরি ২৫ সেমি দূরত্বের সারিতে ১০ সেমি দূরে দূরে ২টি করে ঝাড়শিমের বীজ বপন করলে ফলন বেশি পাওয়া যায়। বীজ বপনের ১০ দিন পর প্রতি পিটে একটি সবল চারা রেখে বাকি চারা তুলে ফেলতে হবে।

বারি ঝাড়শিম-১ এবং পিভিএই-০০১ লাইনের জন্য হেক্টরপ্রতি ৫০-৬০ কেজি এবং পার্বত্য অঞ্চলের স্থানীয় জাতের জন্য ৮০-৯০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

বীজ বপনের সময়

পার্বত্য অঞ্চলে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি থেকে মধ্য-নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে ঝাড়শিমের বীজ বপন করলে ফলন ভাল হয়। তবে সেচের সুযোগ থাকলে ডিসেম্বরের শেষ সময় পর্যন্ত এর বীজ বপন করা যায়।

বেড পদ্ধতিতে ঝাড়শিমের চাষ

সারের মাত্রা

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	৯০-১০০ কেজি
টিএসপি	১৮০-২২০ কেজি
এমপি	১৪০-১৬০ কেজি
কম্পোস্ট	৪-৫ টন

সার প্রয়োগ

জমি তৈরির সময় সম্পূর্ণ কম্পোস্ট, টিএসপি, এমপি ও অর্ধেক ইউরিয়া দিতে হবে। বাকি ইউরিয়া বীজ বপনের ২৫-৩০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

ঝাড়শিম দাঁড়ানো পানি সহ্য করতে পারে না। আবার বেশি শুকনা অবস্থায় ফলন কমে যায়। এ জন্য পানি সেচ ও নিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ফল সংগ্রহ

বারি ঝাড়শিম-১ এবং পিভিএ ই-০০১ লাইন থেকে বীজ বপনের ৪৫-৫০ দিন পর বা ফুল ফোটার ১০-১৫ দিন পর শুঁটি সংগ্রহ করা যায়। এতে হেক্টরপ্রতি ১৪-১৫ টন শুঁটি পাওয়া যায়।

পার্বত্য অঞ্চলের স্থানীয় বড় বীজসম্পন্ন জাতগুলো বপনের ৬০-৭০ দিনের মধ্যে খাবার উপযোগী খাইস্যা বা আধাপাকা বীজ এবং ৭০-৮০ দিন পর পাকা বীজ সংগ্রহ করা যায়। এ জাত থেকে হেক্টরপ্রতি ২.৫-৩.০ টন খাইস্যা বীজ অথবা ১.৪-১.৫ টন শুকনা বীজ পাওয়া যায়।

ঝাড়শিমের সংগ্রহ উপযোগী পড

পাহাড়ী অঞ্চলে বিলাতি ধনিয়ার উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি

বিলাতি ধনিয়া চাষের জন্য দোআঁশ থেকে পলি-দোআঁশ মাটি বেশি উপযুক্ত। বীজ গজানোর জন্য মাটি নরম হওয়া আবশ্যক।

জমি তৈরি

জমির মাটি ৫-৬ বার চাষ ও মই দিয়ে ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। বীজতলার মত করে জমি তৈরি করতে হবে। প্রতি বীজতলার জমির চারদিকে নালার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সেচ দেওয়া ও পানি নিকাশের সুবিধা হয়। এই ধনিয়া ছায়াতেও চাষ করা যায়। জমির উপরে সেক্ষেত্রে মাচাও দেওয়া যায়।

বীজ বপন

রবি মৌসুমে কার্তিক মাসে বা মধ্য-অক্টোবর থেকে মধ্য-নভেম্বরে চাষ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। তবে বীজ ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বপন করা যেতে পারে। হেক্টরপ্রতি ৭৫-৭৮ কেজি প্রয়োজন।

বপন পদ্ধতি

বীজতলায় বীজ ছিটিয়ে বপন করা হয়। বপন করার আগে বীজ পানিতে ২০-২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হয়। ভিজানো বীজ সংগ্রহ করে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে জড়িয়ে ঝুলিয়ে রাখতে হয়। তারপর বীজ মৃদু সূর্যের আলোতে এক ঘণ্টা শুকাতে হয়।

মিহি বালুতে মিশিয়ে বীজ বপন করতে হয়। বীজ বপন করার পর সেচ দিয়ে শুকনা ধানের খড় দিয়ে জাবড়া প্রয়োগ করতে হবে। জমিতে রসের অভাব হলে ঝাঝরি দিয়ে সেচ দিতে হবে। বীজের অঙ্কুরোদদগমের পর জাবড়া

বিলাতি ধনিয়ার গাছ

সরিয়ে ফেলতে হবে। বীজ গজাতে ২০-২৫ দিন সময় লাগে। ছায়া প্রদানের জন্য জমির উপর ঘাস/ধানের খড়/নারিকেলের পাতা দিয়ে মাচা দিতে হবে। মাচার উপরে কুমড়া জাতীয় সবজি চাষ করে বাড়তি আয়ও করা সম্ভব।

সারের মাত্রা

বিলাতি ধনিয়ায় নিম্নলিখিত হারে সার প্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
পচা গোবর	১৫-২০ টন
ইউরিয়া	২৭৫-৩০০ কেজি
টিএসপি	১৩৫-১৫০ কেজি
এমপি	১৭০-২০০ কেজি

সার প্রয়োগ

সম্পূর্ণ গোবর এবং টিএসপি বীজ বপনের পূর্বে শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া এবং এমপি ৩-৫ বার পার্শ্ব প্রয়োগ করতে হবে। বিলাতি ধনিয়ার চারা ২-৩ সেমি উঁচু হলে প্রথমবার ইউরিয়া এবং এমপি পার্শ্ব প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিবার ফসল সংগ্রহের পর ইউরিয়া এবং এমপি পার্শ্ব প্রয়োগ করতে হবে। পার্শ্ব প্রয়োগের সময় মাটিতে উপযুক্ত রস থাকা প্রয়োজন।

পানি সেচ ও নিকাশ

মাটিতে রসের অভাব হলে সেচ দিতে হবে। পানি অতিরিক্ত হলে তা নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

আগাছার উপদ্রব হলে নিড়ানি দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। ৩-৪ বার আগাছা পরিষ্কার করলেই চলে। এতে গাছে উৎপাদন বাড়বে। গাছে মঞ্জরী বের হলে তা ভেঙ্গে দিতে হবে।

বিলাতী ধনিয়ার গোড়া পচা একটি মারাত্মক রোগ। রোগের প্রাদুর্ভাব হলে ছত্রাকনাশক রিডোমিল ০.২% হারে অথবা বোর্দো মিশ্রণ ১% হারে ১৫ দিন অন্তর প্রয়োগ করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ

শিকড়সহ গাছ উঠিয়ে ফসল সংগ্রহ করা হয়। প্রতি খণ্ড জমি থেকে ৭-৮ বার ফসল সংগ্রহ করা সম্ভব। গাছ ১০-১৫ সেমি উঁচু হলে ফসল সংগ্রহ করা হয়। পাতা নরম থাকতে তা খাওয়ার জন্য সংগ্রহ করতে হবে।

বিলাতি ধনিয়ার পাতা

অ-মৌসুমে লেবুর উৎপাদন প্রযুক্তি

কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রাইখালী, রাঙ্গামাটিতে গবেষণা চালিয়ে এ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়। এ প্রযুক্তি অনুসরণ করে অ-মৌসুমে লেবু উৎপাদন করে বেশি লাভবান হওয়া যায়।

প্রধান মৌসুমে অর্থাৎ এপ্রিল-সেপ্টেম্বর মৌসুমে লেবু গাছে অত্যধিক ফুল-ফল হয়। এই সময় গাছ থেকে কিছু ফুল ছাঁটাই বা পাতলা করে দিলে ফলের জন্য গাছের কম শক্তি ব্যয় হয়। ফলে গাছে সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ বেশি থাকে। এই সঞ্চিত শক্তি কাজে লাগিয়ে গাছ অমৌসুমে বা অক্টোবর-মার্চ মাসে বেশি পরিমাণে ফুল-ফল উৎপাদন করে। এই সময় বাজারে মূল্য বেশি থাকায় লেবু বিক্রি করে বেশি লাভ পাওয়া যায়। এপ্রিল-মে মাসে পুষ্প মঞ্জরিতে ফুলের সংখ্যার ভিত্তিতে শতকরা ৫০টি ফুল ছাঁটাই করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ

ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত লেবু সংগ্রহ করা যায়।

মাল্টা

মিষ্টি কমলা বা Sweet orange (*Citrus sinensis*) বাংলাদেশে মাল্টা নামে পরিচিত। কমলার সাথে এর মূল পার্থক্য হ'ল কমলার খোসা ঢিলা কিন্তু মাল্টার খোসা সংযুক্ত (টাইট)। সাইট্রাস ফসলের মধ্যে মাল্টা অন্যতম জনপ্রিয় ফল। বিশ্বের সর্বমোট উৎপাদিত সাইট্রাস ফলের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ হচ্ছে মাল্টা। ভিয়েতনাম, উত্তর পশ্চিম ভারত ও দক্ষিণ চীন মাল্টার আদি উৎপত্তি স্থান। তবে বর্তমানে এই ফলটি বিশ্বের উষ্ণ ও অব-উষ্ণমণ্ডলীয় এলাকায় বেশি চাষাবাদ হচ্ছে। বাংলাদেশেও এই ফলটির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এবং দিন দিন এর জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। কমলার তুলনায় এর অভিযোজন ক্ষমতা অধিক হওয়ায় পাহাড়ী এলাকা ছাড়াও দেশের অন্যান্য এলাকায় সহজেই এটি চাষ করা যাচ্ছে। উন্নত জাত ও আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশে এর উৎপাদন বহুগুণে বাড়ানো সম্ভব।

জলবায়ু ও মাটি

কম বৃষ্টিবহুল সুনির্দিষ্ট গ্রীষ্ম ও শীতকাল অর্থাৎ শুষ্ক ও উষ্ণ জলবায়ু মাল্টা চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত মাল্টার ফলের গুণাগুণকে প্রভাবিত করে। বাতাসের অধিক আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপ্রবণ এলাকায় মাল্টা ফলের খোসা পাতলা হয় এবং ফল বেশি রসালো ও নিম্নমানের হয়। শুষ্ক আবহাওয়ায় ফলের স্বাদ উন্নত মানের হয়। আর্দ্র জলবায়ুতে রোগ ও ক্ষতিকর পোকার উপদ্রব বেশি হয়। মাল্টা গাছ আলো পছন্দ করে এবং ছায়ায় গাছের বৃদ্ধি ও ফলের গুণগত মান কমে যায়। সব ধরনের মাটিতে জন্মালেও সুনিষ্কাশিত, উর্বর, মধ্যম থেকে হাল্কা দোআঁশ মাটি মাল্টা চাষের জন্য উত্তম। মধ্যম অম্ল থেকে সামান্য ক্ষারীয় মাটিতে মাল্টা জন্মে, তবে ৫.৫-৬.৫ অম্লতায় (pH) ভাল জন্মে। মাল্টা জলাবদ্ধতা মোটেও সহ্য করতে পারে না এবং উচ্চমাত্রার তাপ ও লবণের প্রতি সংবেদনশীল।

ফলসহ মাল্টা গাছ

মাল্টার জাত

বাংলাদেশের বাজারে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত সবুজ ও কমলা বর্ণের মাল্টা ব্যাপক হারে বিক্রি হতে দেখা যায়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট 'বারি মাল্টা-১' নামে ২০০৩ সালে মাল্টার একটি উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছে। এ জাতের পাকা ফল দেখতে আকর্ষণীয় সবুজ এবং খেতে সুস্বাদু। জাতটির বৈশিষ্ট্য নিম্নে দেয়া হলো।

বারি মাল্টা-১

নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ খাটো, ছড়ানো ও অত্যধিক ঝোপালো। মধ্য-ফাল্গুন থেকে মধ্য চৈত্র পর্যন্ত সময়ে গাছে ফুল আসে এবং কার্তিক মাসে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল গোলাকার, মাঝারী আকৃতির (১৫০ গ্রাম)। ফলের দৈর্ঘ্য ৭ সেমি এবং প্রস্থ ৫ সেমি। পাক ফলের রং সবুজ। ফলের পুষ্প প্রান্তে পয়সা সাদৃশ সামান্য নিচু বৃত্ত বিদ্যমান। ফলের খোসা মধ্যম পুরো ও শাসের সাথে সংযুক্ত। শাঁস হলুদাভ, রসালো, খেতে মিষ্টি ও সুস্বাদু (ব্রিক্সমান ৭.৮%)। গাছপ্রতি ৩০০-৪০০টি ফল ধরে। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০ টন। বৃহত্তর সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পঞ্চগড়সহ দেশের সব অঞ্চলে চাষের জন্য উপযোগী।

বারি মাল্টা-১

বংশ বিস্তার

বীজ ও কলমের মাধ্যমে মাল্টার বংশ বিস্তার করা যায়। পরিপক্ক ফলের বীজ সংগ্রহ করে কয়েক দিনের মধ্যেই নার্সারিতে স্থাপন করে চারা উৎপাদন করা হয়। তবে বীজের চারা আমাদের দেশের মাটি ও আবহাওয়ার সাথে সমন্বয় করে বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। তাই কলমের মাধ্যমে চারা তৈরি করাই উত্তম। তাছাড়া কলমের মাধ্যমে চারা উৎপাদন করলে সেটার মাতৃগুণাগুণও ঠিক থাকে এবং দ্রুত ফল ধরে। এ ছাড়া রোগ প্রতিরোধী ও বলিষ্ঠ শিকড় সমৃদ্ধ আদিজোড়ের উপর কলম করার ফলে গাছের জীবনকাল ও ফলন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

জোড় কলম

গ্রাফটিং এর জন্য প্রথমে রুটস্টক (আদিজোড়) উৎপাদন করতে হবে। রুটস্টক হিসেবে বাতাবিলেবু, রাফলেমন, কাটা জামির, রংপুর লাইম প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। অতঃপর কাঙ্ক্ষিত মাতৃগাছ হতে সায়ন (উপজোড়) সংগ্রহ করে রুটস্টকের উপর স্থাপন করে মাল্টার গ্রাফটিং তৈরি করা হয়। রুটস্টক হিসেবে ১.০ হতে ১.৫ বছর বয়সের সুস্থ, সবল ও সোজাভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত চারা নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচিত মাতৃগাছ হতে সায়ন তৈরির জন্য দুটি চোখসহ ৫-৬ সেমি লম্বা ও ৮-৯ মাস বয়সের ডাল সংগ্রহ করতে হবে। মধ্য-বৈশাখ থেকে মধ্য-ভাদ্র (মে থেকে আগস্ট) মাস পর্যন্ত গ্রাফটিং করা যায়। ভিনিয়ার ও ক্লেফট গ্রাফটিং উভয় পদ্ধতিতেই মাল্টার কলম তৈরি করা যায়। সাধারণত কলম করার ১০-১৫ দিনের মধ্যে রুটস্টক ও সায়নের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় এবং সায়নের চোখ ফুটে কুঁশি বের হয়। কলম হতে একাধিক ডাল বের হলে সুস্থ সবল ও সোজাভাবে বেড়ে উঠা ডালটি রেখে বাকিগুলো কেটে ফেলতে হবে। আদিজোড় থেকে উৎপন্ন কুশি নিয়মিতভাবে অপসারণ করতে হবে।

উৎপাদন কৌশল

জমি নির্বাচন ও তৈরি

সারাদিন রোদ পড়ে এবং বৃষ্টির পানি জমে না এমন উঁচু বা মাঝারী-উঁচু জমি মাল্টা চাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচিত জমিটি পর্যায়ক্রমিক চাষ ও মই দিয়ে জমি সমান করে নিতে হবে। জমি থেকে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং আশে পাশে উঁচু গাছ থাকলে তার ডালপালা ছেঁটে দিতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি

সমতল ভূমিতে বর্গাকার বা ষড়ভূজী পদ্ধতিতে এবং পাহাড়ী এলাকায় কন্টুর পদ্ধতিতে চারা/কলম রোপণ করা হয়। সাধারণত মধ্য-বৈশাখ থেকে মধ্য-ভাদ্র (মে থেকে আগস্ট) মাসের মধ্যে মাল্টা চারা লাগানো উত্তম। তবে পানি সেচ নিশ্চিত করা গেলে বছরের অন্যান্য সময়ও চারা লাগানো যেতে পারে।

মাদা তৈরি

চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে উভয় দিকে ৪.০ মিটার দূরত্বে ৭৫ × ৭৫ × ৭৫ সেমি মাপের গর্ত করতে হবে। প্রতি গর্তে ১৫ কেজি কম্পোস্ট বা পচা গোবর, ৩-৫ কেজি ছাই, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি সার এবং ২৫০ গ্রাম চুন গর্তের উপরের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। গর্ত ভরাট করার ১০-১৫ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।

চারা/কলম রোপণ

গর্তে সার প্রয়োগের ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত চারা/কলমটি গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে রোপণ করতে হবে। রোপণের পর খুঁটি দিয়ে চারা/কলমটি খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। অতঃপর প্রয়োজনমত পানি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ

গাছের যথাযথ বৃদ্ধির জন্য সময়মত সঠিক পরিমাণে এবং সঠিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। বয়স ভেদে গাছপ্রতি সারের পরিমাণ নিচে দেওয়া হলো।

গাছের বয়স (বছর)	গোবর সার (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)	জিংক সালফেট (গ্রাম)	বরিক এসিড (গ্রাম)
১-২	১০-১২	২০০-৩০০	১০০-১৫০	১০০-১৫০	১০	৫
৩-৪	১২-১৫	৩০০-৪৫০	১৫০-২০০	১৫০-২০০	১৫	৮
৫-৭	১৫-১৮	৪৫০-৬০০	২০০-৩০০	২০০-২৫০	২০	১০
৮-১০	১৮-২০	৬০০-৭০০	৩০০-৪৫০	২৫০-৩০০	২৫	১২
১০ এর অধিক	২০-২৫	৭৫০	৫০০	৪৫০	৩০	১৫

প্রতিবছর মধ্য-ফাল্গুন থেকে মধ্য-চৈত্র (মার্চ) বর্ষার পূর্বে মধ্য-বৈশাখ থেকে মধ্য-জ্যৈষ্ঠ (মে) এবং বর্ষার পর মধ্য-ভাদ্র থেকে মধ্য-আশ্বিন (সেপ্টেম্বর) মাসে তিন কিস্তিতে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে সেচের ব্যবস্থা না থাকলে বর্ষার আগে ও পরে দুই কিস্তিতে সার প্রয়োগ করা ভাল।

আগাছা দমন

বর্ষার শেষে সার প্রয়োগের পর গাছের গোড়া থেকে একটু দূরে বিভিন্ন লতাপাতা বা খড় দ্বারা বৃত্তাকারে মালচ করে দিলে আগাছা দমনসহ শুষ্ক মৌসুমে আর্দ্রতা সংরক্ষিত হয়। সাধারণত বর্ষার শুরুতে ও বর্ষার শেষে সম্পূর্ণ বাগানে হালকা চাষ দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

সেচ প্রয়োগ

ভাল ফলনের জন্য খরার সময় বা শুষ্ক মৌসুমে নিয়মিত সেচ দেয়া একান্ত দরকার। বর্ষার সময় গাছের গোড়ায় যাতে পানি না জমে সে জন্য দ্রুত পানি নিষ্কাশনের বন্দোবস্ত করতে হবে।

ডাল ছাঁটাইকরণ

মাল্টা গাছের জন্য ডাল ছাঁটাই অপরিহার্য। গাছ লাগানোর পর ফল ধরার পূর্ব পর্যন্ত ধীরে ধীরে ডাল ছেঁটে গাছকে নির্দিষ্ট আকার দিতে হবে যাতে গাছ চারিদিকে ছড়াতে পারে। কারণ পার্শ্ব ডালগুলিতে ফল বেশি ধরে। কাণ্ডের এক মিটার উচ্চতা পর্যন্ত সব ডাল ছাঁটাই করতে হবে। ডাল ছাঁটাই করার পর ডালের কাটা অংশে বর্দোপেস্টের প্রলেপ দিতে হবে। এছাড়া পানি তেউড় বা Water sucker উৎপন্ন হওয়ামাত্র কেটে ফেলতে হবে। মরা, শুকনা এবং রোগ ও পোকামাকড় আক্রান্ত ডালপালা কেটে পরিষ্কার রাখতে হবে।

ফল পাতলাকরণ ও ব্যাগিং

বারি মাল্টা-১ এর গাছে প্রতিবছর প্রচুর সংখ্যক ফল আসে। সমস্ত ফল রাখা হলে ফল আকারে ছোট ও নিম্নমানের হয়। এজন্য প্রতি পুষ্প মঞ্জরীতে সুস্থ ও সতেজ দেখে দু'টি করে ফল রেখে বাকিগুলো ছোট থাকা অবস্থায়ই (মার্বেল অবস্থা) ছাঁটাই করা দরকার। কলমের গাছ প্রথম বা দ্বিতীয় বছর থেকে ফল দিতে শুরু করে। গাছের বৃদ্ধির জন্য ১ম বছর ফল না রাখাই ভাল, দ্বিতীয় বছর অল্প সংখ্যক ফল রাখা যেতে পারে। এভাবে পর্যায়ক্রমে গাছের অবস্থা বিবেচনা করে ফল রাখতে হবে। ফলের বর্ণ সবুজ হওয়ায় পাখি ও পোকার আক্রমণ কম হয়। তবে পরিপক্কতার পূর্বে ব্যাগিং করলে অবাঞ্ছিত পোকা মাকড়ের আক্রমণ রোধ করা যায়।

ফল সংগ্রহ

ফল পূর্ণতা প্রাপ্তির সাথে সাথে ফলের গাঢ় সবুজ বর্ণ হালকা সবুজ বা ফ্যাকাশে সবুজ হতে থাকে। বারি মাল্টা-১ সেপ্টেম্বর, অক্টোবর মাসে আহরণ করা হয়। পরিপক্ক ফল হাত অথবা জালিযুক্ত বাঁশের কোটার সাহায্যে সংগ্রহ করা হয়। ফল সংগ্রহের পর আঘাতপ্রাপ্ত ও নষ্ট হওয়া ফলগুলো আলাদা করতে হবে। ভাল মানের ফলগুলো প্রয়োজনে গ্রেডিং করে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে ঠাণ্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে।

নাশপাতি

নাশপাতি মূলত শীতপ্রধান অঞ্চলের ফল। তবে এর কোন কোন প্রজাতি বা জাত অপেক্ষাকৃত উচ্চ তাপমাত্রায়ও জন্মানো যায়। এটি বিদেশি ফল হলেও আমাদের দেশে কম বেশি সবাই ফলটির সাথে পরিচিত। বিদেশ থেকে প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণে নাশপাতি আমদানি করা হয়। দেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এ ফলের চাষ করা সম্ভব।

নাশপাতির জাত

বারি নাশপাতি-১

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট 'বারি নাশপাতি-১' নামে নাশপাতির একটি জাত ২০০৩ সালে অবমুক্ত করেছে। নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। নাশপাতির গাছ খাড়া ও অল্প ঝোপালো। চৈত্র মাসে গাছে ফুল আসে এবং শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফল আহরণ করা যায়। ফলের গড় ওজন ১৩৫ গ্রাম, আকার ৮.৪০ সেমি × ৫.৬৩ সেমি। ফল বাদামী রঙের, ফলের উপরিভাগের ত্বক সামান্য খসখসে। শাঁস সাদাটে, খেতে কচকচে ও সুস্বাদু (ব্রিক্সমান ১০%)। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৬০-৭০টি। জাতটি চট্টগ্রাম ও পার্বত্য জেলাসমূহে চাষ উপযোগী। হেক্টরপ্রতি ফলন ৬-৭ টন।

বারি নাশপাতি-১ এর ফল

নাশপাতির উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি

সাধারণভাবে নাশপাতিকে শীতপ্রধান অঞ্চলের ফল হিসেবে গণ্য করা হয় । যেকোন ধরনের সুনিষ্কাশিত মাটিতে নাশপাতি চাষ করা যায়। তবে উর্বর, সুনিষ্কাশিত দোআঁশ মাটি উত্তম। নাশপাতি চাষের জন্য সূর্যালোক প্রয়োজন। শুষ্ক গরম বায়ু নাশপাতির জন্য ক্ষতিকর। মাটির পিএইচ মান ৫.৫-৭.৫ উত্তম। নাশপাতি গাছ লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে না।

বংশ বিস্তার

স্টেম কাটিং বা শাখা কর্তন ও গুটি কলমের মাধ্যমে নাশপাতির বংশ বিস্তার করা যায়। বর্ষাকাল কলম করার উপযুক্ত সময়। এক বছর বয়স্ক পেন্সিল আকৃতির ডাল কলমের জন্য নির্বাচন করা হয়। ছিদ্রযুক্ত পলিথিনে কলম স্থাপন করে নার্সারিতে ঝাঁঝড়ি দিয়ে পানি দেয়াসহ প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করলে এক বছরের মধ্যে চারা রোপণের উপযোগী হয়।

জমি তৈরি

সুনিষ্কাশিত উঁচু জমি যেখানে কখনই পানি দাঁড়ায় না নাশপাতির জন্য এরকম জমি উত্তম। পাহাড়ের হালকা ঢালু জমিতে নাশপাতি ভাল জন্মে। জমি গভীরভাবে চাষ দিয়ে আগাছা ভালভাবে পরিষ্কার করে জমি তৈরি করতে হয়। চারা রোপণ করার জন্য ৭৫ × ৭৫ × ৭৫ সেমি আকারের গর্ত করে প্রতি গর্তে ১৫ কেজি পচা গোবর, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২০০ গ্রাম এমওপি ও ২০ গ্রাম বরিক এসিড মিশ্রিত করে ১৫/২০ দিন রেখে দিয়ে তারপর চারা লাগাতে হবে।

রোপণ ও পরিচর্যা

সাধরণত সমতল ভূমিতে বর্গাকার এবং পাহাড়ের ঢালে কন্টুর রোপণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত চারা লাগানোর উত্তম সময়। তবে সেচ সুবিধা থাকলে সারা বছরই চারা লাগানো যায়। সারি থেকে সারি এবং

চারা থেকে চারার দূরত্ব ৪ মিটার। এ হিসেবে প্রতি হেক্টর জমিতে ৬২৫টি চারা দরকার হয়। মাদা তৈরি করার পর তাতে ১৫-২০ দিন পর চারা বা কলম লাগাতে হয়। গর্তের ঠিক মাঝখানে চারা লাগাতে হবে তারপর খুঁটি দিয়ে চারাটি বেঁধে দিতে হবে যাতে হেলে না পড়ে। চারা লাগানোর পর চারার গোড়ায় ঝাঝরি দিয়ে পানি দিতে হবে। প্রয়োজনে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ

বয়স অনুপাতে গাছপ্রতি সারের পরিমাণ নিচে দেয়া হলো।

গাছের বয়স	পচা গোবর (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)	বরিক এসিড (গ্রাম)
১-২ বছর	১০	২০০	২৫০	২০০	২০
৩-৫ বছর	১৫	৫০০	৪০০	৪০০	৩০
৬-৯ বছর	২০	৭৫০	৫০০	৬০০	৪০
১০ বছর ও তদুর্ধ	৩০	১০০০	৭৫০	৮০০	৪০

উল্লিখিত সার সমান দুই ভাগ করে বর্ষার আগে একভাগ ও বর্ষার পর বাকি একভাগ প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগ করার সময় ঠিক মধ্য দুপুরে গাছের ছায়া গোড়ার চারদিকে যতটুকু জায়গায় বিস্তৃত হয় এবং গাছের গোড়া থেকে ০.৫ থেকে ১.০ মিটার জায়গা খালি রেখে সেই পরিমাণ জায়গায় ছিটিয়ে কোদাল দিয়ে হালকা করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। পাহাড়ের ঢাল বেশি হলে ঢালের উপরের দিকে গাছের গোড়া থেকে ৪০ সেমি দূরে ১ মিটার এর মধ্যে চোখা মাথা খুঁটির সাহায্যে গর্ত করে সার প্রয়োগ করে গর্তের মুখ মাটি দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। সার প্রয়োগ করার পর প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে।

আগাছা দমন

গাছের পর্যাপ্ত বৃদ্ধি ও ফলনের জন্য সবসময় জমি পরিষ্কার বা আগাছামুক্ত রাখতে হবে। বিশেষ করে গাছের গোড়া থেকে চারদিকে ১ মিটার পর্যন্ত জায়গা সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

সেচ ও নিষ্কাশন

চারা রোপণের পর ঝরনা দিয়ে বেশ কিছু দিন পর্যন্ত সেচ দিতে হয়। সর্বোচ্চ ফলনের জন্য ফুল আসা ও ফলের বিকাশের সময় মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকা আবশ্যক। এ জন্য খরা মৌসুমে সেচ দেয়া প্রয়োজন। বর্ষাকালে গাছের গোড়ায় যাতে পানি জমতে না পারে সে জন্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ডাল ছাঁটাইকরণ

গাছের উচ্চতা ৪০-৫০ সেমি হলে ডগা ভেঙ্গে দিতে হবে। পরের বছর পার্শ্ব শাখা ২০-২৫ সেমি রেখে কেটে দিতে হবে। গাছের গোড়ার দিকে জল/শোষক শাখা বের হলে কেটে ফেলতে হবে। গাছ বড় হলে ডালগুলো ভূমির দিকে বাঁকা করে দিলে বেশি ফলন পাওয়া যায়।

ডাল নুয়ে দেয়া

নাশপাতির খাড়া ডালে নতুন শাখা ও ফল কম হয়। এ জন্য খাড়া ডাল ওজন অথবা টানার সাহায্যে নুয়ে দিলে প্রচুর সংখ্যক নতুন শাখা গজায়। এতে ফলন ও ফলের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

ফল সংগ্রহ ও ফলন

মার্চ-এপ্রিল মাসে গাছে ফুল আসে। জুলাই মাসের শেষ পক্ষে ফল সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। ফল অতি সাবধানে সংগ্রহ করা প্রয়োজন যাতে মাটিতে না পড়ে। কারণ আঘাতপ্রাপ্ত ফল সংরক্ষণ করা যায় না। ফল সংগ্রহের পর সংরক্ষণের জন্য ভালভাবে বাছাই করা দরকার যাতে কোনরূপ ক্রটিযুক্ত ফল না থাকে। তারপর কাগজ বা কাঠের বাক্সে করে বাজারজাত করা উত্তম। এভাবে ১০-১২ দিন পর্যন্ত ফল সংরক্ষণ করা যায়। গাছের বয়স ও আকারভেদে নাশপাতির ফলনে তারতম্য ঘটে। একটি পূর্ণ বয়স্ক গাছ থেকে ২০ - ৪০ কেজি পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায়।

প্যাশন ফল

প্যাশন ফল বাংলাদেশে একটি অপ্রচলিত বা স্বল্প পরিচিত ফল। অনেকের কাছে এটি ট্যাং ফল নামে পরিচিত। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্রগ্রাম অঞ্চল, সিলেট, টাঙ্গাইল এবং রাজশাহী অঞ্চলে ইহা কম বেশি দেখা যায়। তবে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আদিবাসীদের বসতবাড়িতে সল্পপরিসরে অনেকটা অযত্নে ও অবহেলায় ফলটির আবাদ লক্ষ্য করা যায়। ঝুমকো লতার সমগোত্রীয় প্যাশন ফলের গাছ দীর্ঘ প্রসারী এবং বহুবর্ষজীবী। ফলের ভিতর গাত্রে অসংখ্য হলুদাভ, রসপূর্ণ থলে (Juice sac) থাকে, এগুলি ভক্ষণযোগ্য অংশ। টাটকা ফল হিসেবে খাওয়ার চেয়ে প্যাশন ফলের তৈরি শরবত বেশি উপাদেয়। বাংলাদেশের পাহাড়ী এলাকায় এবং সিলেট ও টাঙ্গাইল অঞ্চলে প্যাশন ফল চাষের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

প্যাশন ফলের জাত

বারি প্যাশন ফল-১

বিদেশ থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম মূল্যায়ন শেষে 'বারি প্যাশন ফল-১' নামে উন্নত জাতটি ২০০৩ সালে মুক্তায়ন করা হয়।

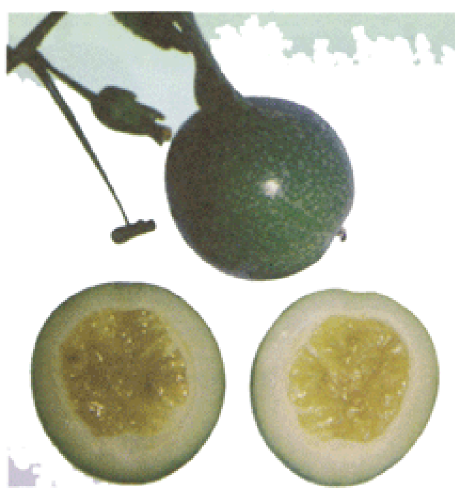

বারি প্যাশন ফল-১

নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ দীর্ঘ প্রসারী, বহুবর্ষজীবী এবং কাষ্ঠল লতা জাতীয়। পাকা ফল দেখতে হলুদ রঙের এবং গাত্র খুবই মসৃণ। ফল উপবৃত্তাকার, আকার ৬.৮ × ৬.৩ সেমি। ফলের গড় ওজন ৬৮ গ্রাম এবং প্রতি ফল থেকে ৩০ গ্রাম জুস আহরণ করা যায়। জুসের রং হলুদ, টক-মিষ্টি স্বাদের (ব্রিক্সমান ১৪%)। এ জাতটি পার্বত্য জেলাসমূহে চাষাবাদের উপযোগী। হেক্টরপ্রতি ফলন ৫-৬ টন। জাতটি *ফিউজেরিয়াম* উইল্ট ও নেমাটোড রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন।

প্যাশন ফলের উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি

সাধারণভাবে প্যাশন ফলকে উষ্ণ ও অব-উষ্ণ অঞ্চলের ফল হিসেবে গণ্য করা হয়। অধিক উষ্ণতা ও শৈত্য কোনটাই এ ফলের জন্য ভাল নয়। বৃষ্টিপাত ফুলের পরাগায়ণে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। যে কোন ধরনের সুনিষ্কাশিত মাটিতে প্যাশন ফলের চাষ করা যায়। তবে উর্বর, সুনিষ্কাশিত দোআঁশ মাটি উত্তম। প্যাশন ফল জলাবদ্ধতা মোটেই সহ্য করতে পারে না। মাটির ক্ষারত্ব (pH) ৫.৫-৭.৫ উত্তম। ক্ষারত্ব ৫.৫ এর নিচে হলে চুন প্রয়োগ করা অত্যাবশ্যক। প্যাশন ফল লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে না।

বারি প্যাশন ফল-১

বংশ বিস্তার

বীজ দ্বারা সহজেই প্যাশন ফলের বংশ বিস্তার করা যায়। তবে বীজ থেকে উৎপাদিত চারায় মাতৃ গাছের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকেনা বিধায় অঙ্গজ পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করা উত্তম। স্টেম কাটিং বা শাখা কর্তনের মাধ্যমে প্যাশন ফলের অঙ্গজ বংশ বিস্তার করা যায়। এক থেকে দেড় বছর বয়সী শাখা নির্বাচন করে তা থেকে ২০-৩০ সেমি লম্বা করে কেটে একেকটি শাখা কলম তৈরি করা হয় যাতে অন্তত ২-৩টি পর্বসন্ধি (নোড) থাকে। কাটিং এর নিচের পর্ব হতে ১-২ সেমি নিচে তেরসা কাট দিয়ে এর নিচের পর্বসহ একেকটি কাটিং পৃথক পৃথক পলিব্যাগের মাটিতে ৪৫° কোণ করে পুঁতে চারা তৈরি করা হয়। কাটিং দ্বারা চারা তৈরির উপযুক্ত সময় হচ্ছে জুন-আগস্ট মাস।

জমি তৈরি

সুনিষ্কাশিত উচুঁ জমিতে যেখানে কখনই পানি দাঁড়ায় না প্যাশন ফলের জন্য এরকম জমি উত্তম। জমি গভীরভাবে চাষ দিয়ে আগাছা ভালভাবে পরিষ্কার করে জমি তৈরি করতে হয়। চারা রোপণ করার জন্য ৪৫ × ৪৫ × ৪৫ সেমি গর্ত করে প্রতি গর্তে ১০ কেজি জৈব সার, ২০০ গ্রাম টিএসপি, ২০০ গ্রাম এমওপি সার মিশ্রিত করে ১৫/২০ দিন রেখে দিয়ে তারপর চারা লাগাতে হবে।

চারা/কলম রোপণ ও পরিচর্যা

বাণিজ্যিকভাবে প্যাশন ফল সারি করে লাগাতে হয়। সাধারণত জুন থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত চারা লাগানোর উত্তম সময় তবে যদি সেচ সুবিধা থাকে তাহলে সারা বছর চারা লাগানো যায়। সারি থেকে সারি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ৪ মিটার। এই হিসেবে প্রতিহেক্টর জমিতে ৬২৫টি চারা/কলম দরকার হয়। মাদা তৈরির ১৫-২০ দিন পর চারা বা কলম গর্তের ঠিক মাঝখানে লাগাতে হয়। রোপণের পর হাত দিয়ে আলতোভাবে মাটি চারার গোড়ার চারদিকে বসিয়ে দিতে হবে। তারপর খুঁটি দিয়ে চারাটি খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে যাতে হেলে না পড়ে। চারা লাগানোর পরপরই চারার গোড়ায় পানি দিতে হবে এবং বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ

নিচে বয়স অনুপাতে গাছপ্রতি সারের পরিমাণ দেওয়া হলো।

গাছের বয়স	গোবর (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)
১-২ বছর	৬	১৫০	১৫০	১৫০
৩-৫ বছর	৮	৩০০	৩০০	৩০০
৬-৯ বছর	১০	৪৫০	৪৫০	৪৫০
১০ বছর ও তদুর্ধ	১৫	৬০০	৪৫০	৬০০

উল্লিখিত সার সমান ৩ কিস্তিতে শীতের শেষে (ফেব্রুয়ারি), বর্ষার আগে (এপ্রিল-মে) ও বর্ষার শেষে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) গাছের গোড়া থেকে সামান্য দূরে প্রয়োগ করে হালকা করে কুপিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

আগাছা দমন

গাছের পর্যাপ্ত বৃদ্ধি ও ফলনের জন্য সবসময় জমি পরিষ্কার বা আগাছামুক্ত রাখতে হবে। বিশেষ করে গাছের গোড়া থেকে চারদিকে এক মিটার পর্যন্ত জায়গা সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

সেচ ও নিষ্কাশন

চারা রোপণের পর বেশ কিছু দিন পর্যন্ত নিয়মিত সেচ দিতে হয়। সর্বোচ্চ ফলনের জন্য ফুল আসা ও ফলের বিকাশের সময় মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকা আবশ্যক। এ জন্য খরা মৌসুমে প্যাশন ফলে সেচ দেওয়া প্রয়োজন। বর্ষাকালে গাছের গোড়ায় যাতে পানি জমতে না পারে সেজন্য নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত করতে হবে।

ডাল ছাঁটাইকরণ

গাছের গোড়া থেকে ১.৫- ২.০ মিটার পর্যন্ত কোন ডালপালা রাখা হয় না তাই এ সমস্ত ডালা সব সময় কেটে দেওয়া ভাল। যেহেতু নতুন শাখায় বেশি ফুল ও ফল উৎপন্ন হয় তাই প্রতি বছর নিয়মিত কিছু শাখা প্রশাখা কেটে দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে পুরাতন ও মরা ডাল কেটে দিতে হয়। শীতকালই ডাল ছাঁটাইকরণের উপযুক্ত সময়।

মাচা তৈরি

লতা জাতীয় গাছ হওয়ায় প্যাশন ফলে মাচা দেয়া আবশ্যক। প্যাশন ফল বাণিজ্যিকভাবে চাষের জন্য বিভিন্ন ধরনের মাচা তৈরি করা হয়ে থাকে। জিআই তাঁর দিয়ে স্থায়ীভাবে মাচা তৈরি করা যায়। তবে অস্থায়ীভাবে বাঁশ দ্বারাও মাচা তৈরি করা যায়। চারা লাগানোর পর যখন চারা বাড়তে শুরু করে অর্থাৎ ৩-৪ মাস পর মাচা তৈরি করতে হয় যাতে গাছের লতা সহজেই মাচায় উঠতে পারে। মাচার উচ্চতা ১.৫ মিটার হলে ভাল হয় যাতে সহজে ফল আহরণ করা যায় ও অন্যান্য পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়। প্রতি ১/২ সারিতে ১টি করে মাচা তৈরি করা যায়।

ফল সংগ্রহ

প্যাশন ফলে ফুল আসার প্রধান মৌসুম হল মার্চ মাস এবং তা থেকে জুলাই -আগস্ট মাসে ফল আহরণ করা হয়। আবার অনেক সময় আগস্ট মাসেও কিছু ফুল আসে তা থেকে ডিসেম্বর- জানুয়ারি মাসে ফল আহরণ করা যায়। ফল সংগ্রহ করার পর প্রথমে সর্টিং এর মাধ্যমে ভাল ও ত্রুটিপূর্ণ (বাজারজাতকরণের অনুপযোগী) ফলগুলো আলাদা করা হয়। তারপর ভাল ফলগুলো গ্রেডিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন সাইজ অনুপাতে ভাগ করে বাজারজাত করা হয়।

অন্যান্য পরিচর্যা

মাছি পোকা দমন

ফলের মাছি পোকা বা ফ্রুট ফ্লাই অনেক সময় কচি ফলের গায়ে ছিদ্র করে ডিম পাড়ে এবং তাতে ফল কুচকে যায় ও অপরিপক্ক অবস্থায় ফল ঝরে পড়ে। সেক্স ফেরোমন ফাদ ব্যবহার করে মাছি পোকা সাফল্যজনক ভাবে দমন করা যায়।

উডিনেস (Woodiness) রোগ দমন

অনেক সময় উডিনেস (Woodiness) নামক একটি রোগ নাশপাতি গাছে দেখা যায় যা কিউকাম্বার মোজাইক ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হয়। এ রোগ আক্রান্ত পাতা বিবর্ণ হয়ে আকারে ছোট হয়। ফলের খোসা মোটা ও শক্ত হয় এবং অল্প পাল্প উৎপন্ন হয়। জাব পোকা (Aphid) দ্বারা এ রোগ ছড়ায়। এ রোগের প্রতিকারের জন্য বাহক পোকা দমন করতে হয়।

তেঁতুল

আমাদের দেশে অপ্রধান ফলের মধ্যে তেঁতুল অন্যতম। ছোট বড় সকলের কাছে বেশ জনপ্রিয়, বিশেষ করে মহিলাদের কাছে তেঁতুলের কদর বেশি। দেশে তেঁতুলের মোট উৎপাদন প্রায় ১০ হাজার টন। টক এবং মিষ্টি দুই ধরনের স্বাদের তেঁতুল রয়েছে। তবে দেশে উৎপাদিত তেঁতুলের অধিকাংশই টক শ্রেণির। পাকা ফল টাটকা অবস্থায় খাওয়া ছাড়াও চাটনি, সস, শরবত, আচার প্রভৃতি মুখরোচক খাবার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

ফলসহ তেঁতুল গাছ

তেঁতুলের জাত

বারি তেঁতুল-১

নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। 'বারি তেঁতুল-১' জাতটি বিদেশ হতে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবন করে ২০০৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন করা হয়। গাছ মাঝারী, মধ্যম ঝোপালো ও ছড়ানো। এপ্রিল-মে মাসে গাছে ফুল আসে এবং মার্চ মাসে ফল সংগ্রহের উপযোগী হয়। ফল মাঝারী (৩২ গ্রাম)। শাঁস নরম, আঠালো এবং মিষ্টি (ব্রিক্সমান ৭৫%)। খাদ্যপযোগী অংশ ৫৩%। হেক্টরপ্রতি ফলন ১০-১২ টন।

বারি তেঁতুল-১

মিষ্টি তেঁতুলের উৎপাদন প্রযুক্তি

তেঁতুল আমাদের দেশে অত্যন্ত সুপরিচিত একটি ফল হলেও মিষ্টি তেঁতুল ততটাই অপরিচিত। তেঁতুলের নাম শোনা মাত্রই সবার কাছে একটি টক স্বাদের ফলের কথা মনে পড়ে যায়। কিন্তু এই তেঁতুলটি সম্পূর্ণ মিষ্টি স্বাদযুক্ত একটি ফল। ২০০৯ সালে পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি 'বারি তেঁতুল-১' নামে একটি মিষ্টি তেঁতুলের জাত উদ্ভাবন করেছে। এই মিষ্টি তেঁতুলের উৎপত্তিস্থল থাইল্যান্ড। ১৯৯৯ সালে প্রথম খাগড়াছড়িতে এর গাছ লাগানো হয় এবং ২০০৭ সালে এটি প্রথম ফল দেয়। মিষ্টি তেঁতুল লিগিউমিনোসী (Leguminosae) পরিবারভুক্ত উদ্ভিদ। খাদ্যমানের দিক থেকেও এটি একটি অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিমান সমৃদ্ধ ফল। প্রতি ১০০ গ্রাম মিষ্টি তেঁতুলে ৭০ গ্রাম ক্যালরি, ১৪.৭ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ৮৬৭ আই.ইউ ভিটামিন 'এ', ৪২৯ মি. গ্রাম ক্যালসিয়াম, ৪৪ মি. গ্রাম ভিটামিন 'সি', ২.৩ গ্রাম প্রোটিন ও ৬.৩ গ্রাম আঁশ পাওয়া পায়। তদুপরি মিষ্টি তেঁতুলে রোগবালাই ও পোকার আক্রমণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম এবং এর চাষাবাদ সহজ হওয়ায় বাংলাদেশে বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলে এর চাষাবাদের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। মিষ্টি তেঁতুলের বাজার মূল্য ও চাহিদা খুব বেশি। তাই বাংলাদেশে এর চাষাবাদ ও প্রচার ব্যপকভাবে বৃদ্ধি করা দরকার।

জলবায়ু ও মাটি

মিষ্টি তেঁতুল মৃদু উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে ভাল জন্মে। তবে সুনিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকলে ভারী বৃষ্টিপাতযুক্ত স্থানেও হয়। উঁচু, উর্বর, গভীর সুনিষ্কাশিত এবং মৃদু অম্লভাবাপন্ন বেলে দোআঁশ মাটিতে ভাল হয়। মিষ্টি তেঁতুলের জন্য সর্বোচ্চ ৪৬ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রা এবং বাৎসরিক ৫০০-১৫০০ মি.মি. বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। মিষ্টি তেঁতুল সমুদ্র সমতল থেকে প্রায় ১০০০ মি. উচ্চতা পর্যন্ত জন্মে। সাধারণত এ গাছ মৃদু অম্ল ও ক্ষারযুক্ত মাটি সহ্য করতে পারে। কিন্তু বেলে দোআঁশ মাটিতেও ভাল হয়।

বংশ বিস্তার

বীজ এবং অঙ্গজ দুই ভাবেই মিষ্টি তেঁতুলের বংশ বিস্তার করা সম্ভব।

বীজ দ্বারা

পরিপক্ক বীজ বীজতলায় চারা তৈরি করে বংশ বিস্তার করা যায়। এক্ষেত্রে বীজ গজানোর জন্য এক সপ্তাহ সময় লাগে। মিষ্টি তেঁতুলের বীজ ভালভাবে শুকিয়ে রাখলে কয়েক মাস পর্যন্ত এর সজীবতা বজায় থাকে। কিন্তু বংশ বিস্তারের জন্য সংগৃহীত বীজ একটি উৎকৃষ্ট মানসম্পন্ন গাছ থেকে নির্বাচিত হওয়া উচিত। বীজ থেকে প্রাপ্ত গাছের গুণাগুণ মাতৃগাছের মত না হওয়ায় এবং ফলন দেরিতে হওয়ায় এ পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রেই পরিহার করা হয়। বীজ থেকে প্রাপ্ত গাছ ৭-৮ বছরে ফল দেয়।

অঙ্গজ বংশ বিস্তার

মিষ্টি তেঁতুলের ক্ষেত্রে অঙ্গজ উপায়ে বংশ বিস্তার করে ভাল ফল পাওয়া সম্ভব। অঙ্গজ উপায়ে উৎপাদিত গাছে মাতৃগাছের গুণাগুণ বজায় থাকে। এক্ষেত্রে গুটি কলম ও গ্রাফটিং এর মাধ্যমে ভাল ফল পাওয়া যায়। এরকম গাছ থেকে ৩-৪ বছরের মধ্যেই ফল পাওয়া সম্ভব। কিন্তু এই সব পদ্ধতির ক্ষেত্রে গাছের কাণ্ডটি নির্বাচনের পূর্বে খুব ভাল করে খেয়াল করতে হবে যে, তা যেন রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে মুক্ত হয়।

লেয়ারিং (Layering)

বর্ষাকাল গুটি কলম করার উপযুক্ত সময়। এক বছর বয়স্ক পেন্সিল আকৃতির ডাল গুটি কলমের জন্য নির্বাচন করা হয়। শাখার অগ্রভাগ থেকে ৩০-৪০ সেমি দূরে পর্বসন্ধি থেকে ১ সেমি নিচে ৩-৪ সেমি জায়গা জুড়ে শাখার চতুর্দিকের বাকল তুলে ফেলা হয়। তারপর ক্ষতস্থানে লালচে স্তর (ক্যাম্বিয়াম) চাকু দ্বারা ভালভাবে চেঁছে তুলে ফেলা হয়। ক্যাম্বিয়াম স্তর না তুলে ফেলা হলে এতে শিকড় গজায় না। এরপর ক্ষতস্থানের অগ্রবর্তী নিকটতম পর্বসন্ধিসহ ক্ষতস্থানটিকে শিকড় মাধ্যম (অর্ধেক মাটি, অর্ধেক গোবর ও পানির মিশ্রণে তৈরি পেস্টের মত) দ্বারা আবৃত করে সাদা পলিথিন কাগজ দ্বারা পেঁচিয়ে চিকন সুতলি দ্বারা বেঁধে দিতে হবে। এ কলম করার ৪-৮ সপ্তাহের মধ্যে এতে শিকড় গজায়। শিকড় গজানোর পর গুটির ১-২ সেমি নিচে ২-৩ ধাপে কলমটিকে কেটে মাতৃগাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। কিছু পাতা ফেলে দিয়ে ছিদ্রযুক্ত পলিথিনে কলম স্থাপন করে নার্সারিতে ঝাঁঝড়ি দিয়ে পানি দেয়াসহ প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করলে এক বছরের মধ্যে চারা রোপণের উপযোগী হয়।

গ্রাফটিং

গ্রাফটিং বলতে বুঝায় একটি কাঙ্ক্ষিত গাছের একটি কাণ্ড বা মুকুল কেটে নিয়ে অপর একটি গাছে (রুটস্টক) প্রতিস্থাপন করা। তারপর প্রতিস্থাপিত কাণ্ডটি অথবা মুকুলটি রুটস্টকের সাথে সফলভাবে জোড়া লেগে গেলেই গ্রাফটিং সফলভাবে শেষ হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। গ্রাফটিং করার সময় সাধারণত একটি অধিক কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন গাছ থেকে কাণ্ড বা কুঁড়ি সংগ্রহ করে অপর একটি সাধারণ রুটস্টকে সংযোজন করা হয়। গ্রাফটিং ফল ধারণের সময় কমিয়ে আনে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

মিষ্টি তেঁতুলের গুটি কলম

গ্রাফটিং এ ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিসমূহ হলো

- একটি পরিষ্কার ও ধারালো কাঁচি
- পলিথিন ট্যাপ (১.৫-২ সেমি চওড়া ও মোটামুটি ৩০-৪০ সেমি লম্বা যা একটি সাধারণ পরিষ্কার প্লাস্টিক ব্যাগ থেকে কেটে সংগ্রহ করেও কাজ চালানো সম্ভব যদি বাডিং ট্যাপ না থাকে।

ক্লেফট গ্রাফটিং বা ফাটল জোড়কলম

বসন্ত ও শরৎকাল এ কলম করার সবচেয়ে উপযোগী সময়। বিশেষত বসন্তের শুরুতে যখন গাছের সুপ্ততা ভেঙ্গে আসতে থাকে তখনই এ কলম করা হয়। এ কলম তৈরির জন্য সাধারণত ২.৫-১০ সেমি ও ব্যাসের আদিজোড় নির্বাচন করা হয়ে থাকে। নির্বাচিত আদিজোড়ের মসৃণ শাখাবিহীন স্থানে ধারালো ছুরি দ্বরা আনুভূমিকভাবে কেটে সেখানে লম্বাভাবে ৫-৭.৫ সেমি গভীর করে ফাটাতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হয় যেন ফাটানো কাজটি খাড়াভাবে হয়। উপজোড় প্রস্তুতের জন্য সাধারণত ২-৩টি কুঁড়িযুক্ত ৭.৫-১০ সেমি দীর্ঘ উপজোড় শাখা নির্বাচন হয়। নির্বাচিত উপজোড়ের নিচের প্রান্তে তির্যক কর্তনের মাধ্যমে একটি গোজের মত তৈরি করা হয়। অপেক্ষাকৃত বড় আদিজোড় অর্থাৎ ২.৫ সেমি ব্যাসের চেয়ে বেশি ব্যসযুক্ত আদিজোড়ের জন্য একটি উপজোড় গোজের পরিবর্তে দুটি গোজ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রতিটি গোজকেই ফাটলের যে কোন একপাশে বা কিনারে স্থাপন করা হয়। যদি এ ফাটলের মধ্যে উপজোড় গোজ শক্ত বা আঁটোসাঁটো হয়ে না বসে তবে সংযোগস্থান শক্ত করে বেঁধে আটোঁসাঁটো করা হয় এবং সংযোগ স্থান গ্রাফটিং মোম দ্বারা এমনভাবে আবৃত করা হয় যাতে ভিতরে কোন পানি ঢুকতে না পারে। এছাড়া সমস্ত কলমটিকে একটি পলিথিন দ্বারা আবৃত রাখলেও কলমের মধ্যে সহজে পানি ঢুকতে পারে না।

চারা রোপণের সময়

চারা রোপণ জুন-নভেম্বর মাসে করতে হবে। অতঃপর চারা প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়মিত পানি সেচ দিতে হবে। তবে আষাঢ়-ভাদ্র (মধ্য জুন-মধ্য সেপ্টেম্বর) মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়।

জমি প্রস্তুত ও গর্ত তৈরি

গর্ত তৈরির পূর্বে জায়গাটির আগাছা ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় গাছপালা অপসারণ করতে হবে। তারপর কোদালের সাহায্যে গর্ত তৈরি করতে হবে। গর্তের আকার হতে হবে ১ মি. × ১ মি. × ১ মি.।

গর্তে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ
পচা গোবর	২০-২৫ কেজি
টিএসপি	৪০০-৫০০ গ্রাম
এমপি	৫০০-৬০০ গ্রাম
জিপসাম	২০০-৩০০ গ্রাম
জিঙ্ক সালফেট	৪০-৬০ গ্রাম

উল্লিখিত সার গর্তের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে ১০-১৫ দিন রেখে দিতে হবে। মাটিতে রসের পরিমাণ কম থাকলে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

চারা রোপণের দূরত্ব

১০ মি. × ১০ মি.।

চারা রোপণ

সুস্থ সতেজ এক বছর বয়সী চারা গর্তের মাঝখানে এমনভাবে রোপণ করতে হবে যেন চারার গোড়াটি মাটির বল ভেঙ্গে না যায়। চারা রোপণের পর গাছের গোড়ার মাটি ভালভাবে চেপে দিয়ে হালকা সেচ দিতে হবে। রোপণের পর চারা যাতে হেলে না পড়ে সে জন্য শক্ত কাঠি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে এবং চারায় বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

আগাছা ব্যবস্থাপনা

চারা অবস্থায় গাছের চারদিকের আগাছা অবশ্যই পরিষ্কার করা উচিত। অন্তত চার বছর পর্যন্ত আগাছা ব্যবস্থাপনা করা উচিত যাতে গাছের বৃদ্ধি ব্যহত না হয়। বাণিজ্যিকভাবে যে সব বাগান করা হয় বিশেষ করে সেসব ক্ষেত্রে যদি আন্তঃফসল হিসেবে কোন গাছ না থাকে তাহলে আগাছা দমন অত্যন্ত জরুরি। এতে বাগানের মাটিতে সঠিক পরিমাণে আর্দ্রতা ধরে রাখা সম্ভব।

আন্তঃফসল

গাছ লাগানোর প্রথম চার বছর পর্যন্ত বাগানে আন্তঃফসল করা যায়। এ ক্ষেত্রে আন্তঃফসল হিসেবে সাধারণত বাদাম, শাকসবজি, বরবটি, মুগডাল, ফেলন, স্বল্পমেয়াদী দানা জাতীয় শস্য, আদা ও হলুদ চাষ করা যেতে পারে।

পানি সেচ ও নিষ্কাশন

মিষ্টি তেঁতুল একটি খরা সহনশীল গাছ। প্রাপ্ত বয়স্ক বা প্রতিষ্ঠিত তেঁতুল গাছে পানি প্রয়োগের তেমন একটা প্রয়োজন হয় না। কিন্তু চারা অবস্থায় মাটির অর্দ্রতার বিশেষ প্রয়োজন হয় বলে ভালভাবে চারা প্রতিষ্ঠার জন্য নার্সারিতে প্রতি ২ সপ্তাহ অন্তর অন্তর পানি দিতে হয়। পানি সব সময় বিকেলে দিতে হয়। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত পানি সেচ দিলে গাছের গোড়ায় পানি আটকে চারা মারাও যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে পানি নিষ্কাশনের জন্য নালা করতে হবে যাতে অতিরিক্ত পানি নালার মাধ্যমে নিষ্কাশন করা যায়।

পরবর্তী পরিচর্যা

ছাঁটাইকরণ

চারা গাছের ডাল ছাঁটাই অপরিহার্য। গাছ লাগানোর পর থেকে ফল ধরার পূর্ব পর্যন্ত ধীরে ধীরে ডাল ছেঁটে গাছকে নির্দিষ্ট আকার দিতে হবে যাতে গাছ চারিদিকে ছড়াতে না পারে। তারপর নির্দিষ্ট আকার প্রাপ্তির পর থেকে শুধুমাত্র শুকনা ও মরা পাতা এবং ডাল কাটতে হবে।

রোগ ও পোকার আক্রমণ

মিষ্টি তেঁতুল গাছে রোগ ও পোকামাকড়ের তেমন উপদ্রব লক্ষ্য করা যায় না। তবে মাঝে মাঝে ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা যায়।

ফল ছিদ্রকারী পোকা দমন

- ফল সংগ্রহ করার পর পর মৃত, অর্ধমৃত, শুকনা ডালপালা ছাঁটাই করে দিতে হবে।
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করতে হবে।

- ফল ধরার পর আক্রমণ শুরু হলে আক্রমণের শুরতেই প্রতিলিটার পানিতে ৫০ গ্রাম আধা ভাঙ্গ নিমের বীজ সারারাত ভিজিয়ে রেখে সকাল বেলা পুরো গাছে স্প্রে করতে হবে।
- তারপরও আক্রমণ দেখা গেলে সুমিথিয়ন ৫০ইস ২ মিলি হারে প্রতিলিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

ফুল আসার সময়

এপ্রিলের শেষের দিকে সাধারণত মিষ্টি তেঁতুল গাছে ফুল আসে।

ফল সংগ্রহ

মিষ্টি তেঁতুলের ফল সংগ্রহের উপযোগী হয় বসন্তের শেষ দিকে এবং গ্রীষ্মের শুরতে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)।

ফলের পরিপক্কতা ও ফলন

মিষ্টি তেঁতুলের সব ফল একসাথে পরিপক্ক হয় না। তাই হারভেস্টও করতে হয় আলাদা আলাদা সময়ে। সাধারণত গাছ থেকে ফল পাড়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, প্রত্যেকটি পডের বাইরের রং যেন বাদামী বর্ণের হয়। সুষ্ঠুভাবে পরিপক্ক ফলের ভিতরের পাল্প আঠালো ও বাদামী বা গাঢ় বাদামী রঙের হয় এবং বীজগুলো শক্ত ও চকচকে হয়। আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সম্পূর্ণ পরিপক্ক অবস্থায় মিষ্টি তেঁতুলের পডের বহিঃত্বক খুব সহজেই হাত দিয়ে চাপ দিয়ে ভাঙ্গ যায় এবং চাচ দিলে একটি মচমচে শব্দ হয়। আর পডের ভিতরের পাল্প শুকিয়ে সামান্য কুঁচকে যায়।

ফল সংগ্রহের উপায়/কৌশল

গাছ থেকে পাকা অবস্থায় মিষ্টি তেঁতুল সংগ্রহের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপায় হলো মই দিয়ে গাছে উঠে একটি একটি করে পাড়া যাতে এর বাইরের ত্বক ভেঙ্গে না যায়। কারণ মিষ্টি তেঁতুলের শেলফ লাইফ মোটামুটিভাবে পুরোটাই নির্ভর করে এর বহিঃত্বক বা খোসার ওপর। কারণ বহিঃত্বক ভেঙ্গে গেলে পড খুব তাড়াতাড়ি ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং উপযুক্ত বাজার মূল্য পাওয়া যায় না।